দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JAN 1988 পৃষ্ঠা 6 কলাম

010

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ধর্মপ্রাণ শিক্ষাবিদ আহছান উল্লাহ্

জমায়েত আলী

অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে যাঁরা মানুষকে দীক্ষা দেন, সৎ ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত রেখে যাঁরা মানুষকে এই পতাকার তলে সমবেত হবার অভয়বাণী শোনান এবং সরল ও সঠিক পথ অনুসরণ করে পরম করুণাময়ের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যাঁরা পার্থিব লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকার দিক নির্দেশনা দেন তাঁদের মধ্যে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ্ (রঃ) অন্যতম। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের পাহাড় ডিঙিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যাঁরা অকুতোভয়ে সামনে এগিয়ে যান বিজয়ের মালা তাঁদের গলায় ওঠে সবার আগে। যেমন উঠেছে বিজয়ের মালা সুফী সাধক চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ জনাব আহছান উল্লাহ্র গলায়। অবশ্য কর্মনিষ্ঠা ও সাধনার বলে জনাব আহছান উল্লাহ্ কেবল পার্থিব উন্নতির শীর্ষে পৌছাননি, সেই সাথে আখেরাতের মুক্তির পথও সুগম করতে সক্ষম হয়েছেন। বলা বাহুল্য, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় পথের উন্নতি লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই হলেন অসাধারণ। তাঁরা সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। এমনই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন জনাব খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ্।

জনাব আহছান উল্লাহ্র জন্ম ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এমন এক সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন যখন শিক্ষা-দীক্ষায় মোসলমানরা ছিল অনেক পিছিয়ে। ইংরেজী শিক্ষাকে তারা ঘৃণা করতো। এ কারণে মোসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। মুসলিম সমাজের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে জনাব আহছান উল্লাহ্ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে। অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুসলিম সমাজ তথা সকল শ্রেণীর জনগণকে মুক্ত করার এই মহান ব্রত নিয়ে জনাব আহছান উল্লাহ্ শিক্ষা বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরি জীবন শুরু হয় তাঁর রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপার নিউমারারী শিক্ষকের পদে দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। রাত ও দিনের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি পার্থক্য রয়েছে ইহকাল এবং পরকালের মধ্যে। দুনিয়ার উপার্জিত কোন অর্থ, জমি-জমা ইত্যাদি পরকালে কাজে লাগবে না এটা চিরন্তন সত্য কথা। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন অর্থের। সম্মান বাড়াতে হলে প্রয়োজন গাড়ী ও বাড়ীর। আর গাড়ী, বাড়ী ও অর্থ উপার্জনের জন্যে পরকালের কথা ভুলে যেয়ে মিথ্যা ও জালিয়াতির পাকে হাবুডুবু খেতে হয়। আশ্রয় নিতে হয় শত ফন্দি-ফিকিরের। এভাবে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ আহছান উল্লাহ্র দীর্ঘ কর্মজীবনে এসব দুর্নীতির ছোঁয়া লাগেনি। চাকরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অনেক বড় বড় পদ অলংকৃত করেছেন। নিজের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার বলে তিনি অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের শিক্ষা বিভাগের প্রথম সহকারী পরিচালকের গৌরবমাখা পদে ভূষিত হয়েছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজে নিজের হাতে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করার পর বাকী অর্থ তিনি সরকারী খাতে জমা দিয়েছেন। একটা পয়সাও নিজের প্রয়োজনে খরচ করেননি।

'আমার জীবনধারা' নামক গ্রন্থে শিক্ষাবিদ আহছান উল্লাহ্ বলেছেন, "পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেন্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। Mr. H. Sharp, M. A. ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মোছলেম শিক্ষার উৎকর্ষ হেতু ডিরেক্টর মহোদয় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য আমি আশাতীত সাহায্য পাইয়াছিলাম। তাঁহারই সাহায্যে সাবডিভিশন্যাল হাই স্কুলগুলির অবয়ব ও সৌষ্ঠব বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী হাই স্কুলগুলি আমারই তত্ত্বাবধানে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু অর্থ ব্যয়ে স্থায়ী গৃহবাস নির্মিত হয়। এককালীন ব্যয়ের জন্য প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা এই গরীবের কর্তৃত্বাধীন ব্যয়িত হইত। শহরের উপকণ্ঠে শাওড়াতলী নামক স্থানে জমি খরিদ করিয়া সরকারী সাহায্যে বিরাট স্কুল নির্মাণ করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বহু স্থানে হিন্দু ও মোছলেমের হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

হিন্দু জমিদার বাড়ীতেও অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোটকথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী ছিলাম। ফলে সকলের সৌহার্দ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্নই উঠিত না। সত্য বটে, বহু মোছলেম পল্লীতে নূতন নূতন স্কুল সৃষ্ট হইয়াছিল। কোন ইন্সপেক্টর এত দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে থাকিবার অবসর পান নাই। বলিতে কি, হিন্দু-মোছলেমের অনেকেরই ধারণা এই ছিল যে, আমি চট্টগ্রামের অধিবাসী। সুখের বিষয়, এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোন ব্যক্তি, দল বা সমাজের সহিত আমার মনোমালিন্য ঘটে নাই।"

জনাব আহছান উল্লাহ্ কেবল পার্থিব লোভ-লালসা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন তা-ই নয়, শিক্ষার মধ্যে যেন কোন দুর্নীতি না থাকে সেদিকে ছিলেন সদা তৎপর। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। কেউ এমন অসদুপায় অবলম্বন করলে তিনি নিজের হাতে শাস্তি দিতেন। এমনি এক শাস্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সম্মানিত এক উকিলের ছেলে একবার এক স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়। উকিলের ছেলে বলে কোন শিক্ষক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পাননি। জনাব আহছান উল্লাহ্ এই ঘটনার কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে এমন আরো ঘটনা ঘটবে। যার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। তিনি বালকটিকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নিলেন। ঠিক সময়ে বালককে ডেকে পাঠানো হলো এবং তাকে তার অপরাধ সম্বন্ধে অবহিত করা হলো। কেমন ধরনের শাস্তি বালকটির ওপর আরোপিত হয় তা দেখার জন্যে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উদগ্রীব। বালকটির নাম ভাদুড়ী। জনাব আহছান উল্লাহ্ সবার উপস্থিতিতে আদেশ করলেন, "দেখ ভাদুড়ী, তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ। ভালরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, তুমি টেস্ট পরীক্ষার মুদ্রিত প্রশ্ন অফিস থেকে বের করে বন্ধু-বান্ধবকে বিলি করেছ।

যার ফলে অধিকতর অর্থ ব্যয়ে পুনরায় প্রশ্ন ছাপতে হয়েছে এবং সবাইকে অযথা হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। সমবেত শিক্ষকদের অভিমত যে, তোমাকে এ জন্যে ২৫টি বেত্রাঘাত সর্বসমক্ষে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তোমাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে। আর কখনও তোমাকে পড়ার অনুমতি দেয়া হবে না। আমি হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে এই শাস্তি দিচ্ছি না। পূর্ণ এক সপ্তাহ ধীরভাবে চিন্তা করে আমার সহকর্মীদের সাথে একমত হয়ে স্কুলের ভবিষ্যৎ শৃংখলার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছি। এখন যদি তোমার শাস্তি গ্রহণের ইচ্ছা থাকে তাহলে হাত বাড়াও।"

উল্লেখ্য যে, এই শাস্তির পর বালকটি ভবিষ্যতে এমন অপরাধ করতে সাহস পায়নি। এমনিভাবে জনাব আহছান উল্লাহ্ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল নৈরাজ্য দূর করে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হন। কর্তব্যে যেমন ছিলেন তিনি কঠোর, ব্যক্তিত্বে তেমনি ছিলেন মার্জিত ও রুচিশীল। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ছিল তাঁর নীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নীতির প্রশ্নে তিনি কোনদিন আপোষ করেননি। শত কাজের মাঝেও তিনি আল্লাহকে স্মরণ রাখতেন। কোরানের বাণী ও রসূলের সুন্নাহ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি দরদ দিয়ে হামদ্ ও না'ত শুনতেন, গজল শুনতেন। হামদ, না'ত ও গজল শোনার সময় পরম করুণাময়ের প্রতি এমন আকৃষ্ট হতেন যে, তিনি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। চাকরি জীবনে তিনি চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়া, ছনুয়া উপদ্বীপ, বান্দরবান, দোহাজারী, টেকনাফ, ছাগলনাইয়া, ময়নামতি, মধুমতি, আগরতলা, মেদিনীপুর ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকায় স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। এসব এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে তিনি আল্লাহর প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন, সাথে সাথে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

এমনি এক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "একদা স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার কাঁথীতে গিয়াছিলাম। সংগে ছিল আমার পুরাতন বন্ধু কাজী মাজেদ বখশ। সমুদ্র তীরে ডাক বাংলা। সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাতে সমুদ্র দর্শনে বাহির হইলাম। দেখিতেই মনে এক আলোড়ন আসিল। সসীম দেহে অসীমের চিন্তা প্রবেশ করিলে দেল উথলিয়া উঠে। অসীমের স্থান সসীমের বক্ষ ধারণ করিতে পারে না। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম "দয়াময় দয়া কর এ অভাজনে" শরীর অবসন্ন হইল। অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। বাক্য রোধ হইল। অতিকষ্টে কাজি সাহেব আমার অর্ধমৃত দেহকে ডাক বাংলায় পৌছাইলেন।"

জনাব আহছান উল্লাহ্ ছিলেন এমন এক ধর্মপ্রাণ সাধক ও সুফী মানুষ যিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন কি প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতিও ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। পথ চলতে যেখানে মিলাদের সুললিত সুর তিনি শুনতেন সেখানেই বসতেন মিলাদ পড়তে।

জনাব আহছান উল্লাহ্র জীবন ছিল ত্যাগ ও নিষ্ঠার জীবন। দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত থেকে তিনি কেবল স্কুল ও শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজে ব্যস্ত থাকেননি, শিক্ষার মান উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, কোন্ পথ অবলম্বন করলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দূর হয়, কোন্ পথে পা বাড়ালে গরীব ও মেধাবী ছাত্ররা আরো পড়াশুনায় আগ্রহী হয় এ সব ছিল তাঁর চিন্তা।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা হতো। এই নাম লেখার দরুন নম্বর কম-বেশী দেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। দেখা যেত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোসলমান পরীক্ষার্থীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করছে অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন মোসলমান ছাত্র ভাল ফল লাভ করতে পারছে না। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন হিন্দু ছাত্র এমন ভাল ফল করতে পারছে না। বিষয়টি শিক্ষাবিদ আহছান উল্লাহ্র মনে দাগ কাটলো। খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতায় ক্রমিক

তিনি তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। অনেক আন্দোলন ও বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতায় ক্রমিক নম্বর দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। সে সময় উচ্চ ও মাধ্যমিক মাদ্রাসা থেকে পাস করা কোন ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে পারতো না। তাঁর উদ্যোগে মাদ্রাসার মান উন্নীত করা হয়। এরপর মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া তিনি স্কুল-কলেজে মৌলবীর পদ সৃষ্টি করেন। কলকাতার মুসলিম ছাত্রদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করেন। সরকার মুসলিম শিক্ষার ভার জনাব আহছান উল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাই স্কুল ও কলেজ তাঁরই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়। মুসলিম লেখকদের পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ তিনিই সৃষ্টি করেন। মুসলিম ছাত্রদের জন্য তিনি বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল এবং মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করেন। উপরন্তু তিনি স্কুল ও কলেজে মুসলিম বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ করেন। তাঁর উদ্যোগে গরীব মুসলিম ছাত্রকে বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্য নিয়োগ তাঁর উদ্যোগেই করা হয়। এভাবে পাঠ্যবইয়ে ইসলামী শব্দ প্রয়োগের পথ সুগম হয়। স্কুল ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমানের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

জনাব আহছান উল্লাহ্ (রঃ) পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ লাভ করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সার্বিক শক্তি প্রয়োগ করে তিনি মুসলিম শিক্ষার উতকর্ষ সাধন করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা বিভাগে বহু মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময় কোন মুসলিম স্নাতক শিক্ষা বিভাগে যোগ দিতে চাইত না। তিনি নিজের উদ্যোগে তাদের উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা বিভাগে চাকরি প্রদান করেন। তিনি লিখেছেন, "যে সকল মুষ্টিমেয় মুসলিম বালক বিএ পাস করিত, তাহারা হাকিম হইবার জন্য লালায়িত থাকিত। এক্সিকিউটিভ সার্ভিস ব্যতীত এডুকেশন সার্ভিসে কেহ প্রবেশ করিতে চাহিত না। আমি বহু প্ররোচনা দ্বারা কোন কোন মুসলিম গ্র্যাজুয়েটকে শিক্ষা বিভাগে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

জনাব আহছান উল্লাহ্ (রঃ) এমনিভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মত সকল ক্ষেত্রে সজাগ থেকেছেন। বেকারদের তিনি দিয়েছেন চাকরির সুযোগ। অশিক্ষিতদের দিয়েছেন শিক্ষার আলো। অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে দিয়েছেন জ্ঞানের আলো। এভাবে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রের নানা সংস্কার সাধন করেছেন। মুসলিম লেখকদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি নিজের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন মখদুম লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী থেকে অনেক খ্যাতিমান মুসলিম লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে।

আনোয়ারা, বিষাদ সিন্ধু ইত্যাদি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই তাদের অন্যতম। জনাব আহছান উল্লাহ্ নিজেই ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। লেখনীর মাধ্যমে তিনি কোরআন, হাদিস, ইসলামের মাহাত্ম্য, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামের দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে অবহিত করেছেন এবং ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি ৭৭টি বই লিখেছেন।

তাঁর অনুপস্থিতিতে জনগণ যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়, ইসলামের অনুশাসন থেকে তাঁর অনুসারীরা যাতে বিচ্যুৎ না হয় সে জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আহছানিয়া মিশন। সুফী আহছান উল্লাহ্র মূলমন্ত্র "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা" দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সদা তৎপরতা রয়েছে। ১৯৬৫ সালে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা আজো পূরণ হয়নি। জাতি এই নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ, জ্ঞান তাপস, সুফী ও সাধকের অভাব বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিলে তিলে অনুভব করছে।